আয়না

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানিভরতি একটা মগ। পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা আয়না। আয়নাটার স্ট্যান্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে দাঁড় করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখভরতি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাড়ি কাটা যায় না। মুখে সাবান মেখে অপেক্ষা করতে হয়। একসময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাড়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন কিছু আছে কি না কে জানে। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকাল বেলার সময়টা হল ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কী দরকার বিরক্ত করে ?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরানো আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছোট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনও কিনে উঠতে পারেনি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সবসময় সব কথা মনে থাকে ?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই আয়না তো কেনা হচ্ছে না ! আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হল। সে এ বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সেজন্যেই সবসময় একধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। শওকত সাহেব বললেন, মা, ঘরে স্যাভলন আছে ?

ইরা বলল, জানি না বাবা।

সে যেরকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সেরকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালোমত তাকালও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কি না এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাণ্ড ! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণী-করা। দুদিকে দুটা বেণী ঝুলছে। দুটা বেণীতে দু'রঙের ফিতা। একটা লাল একটা সাদা। মেয়েটার মুখ গোল, চোখ দুটো বিষণ্ন। মেয়েটা কে ?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হল, হয়তো টুকটাক কাজের জন্য বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা, তা হলে আয়নায় মেয়েটা এল কোত্থেকে ? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন, ঐ তো মেয়েটা বসে আছে, তার রোগা-রোগা ফরসা পা দেখা যাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কী ?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এল। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

শওকত সাহেব আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কীভাবে ? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না-হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উলটো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তারপরই মনে হল—কী দরকার ! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তাছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভালো লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারণে নানান কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা—তারচে' বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

'কী শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনো কেন ? ভাবির সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি ?'

'আজকের শার্টটা তো ভালো পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।'

'শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।'

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব মেলান। মাঝে মাঝে হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসিহাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হল শওকত সাহেব আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চ্যাংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেন নি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াছেড়া হয়ে যায়ই। তাছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে ? কেনই-বা করবে ? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তারপরেও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে ? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিস। হিসাবনিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এমনিতেই টেলিভিশন তাঁর ভালো লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্যি। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিস সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে, যে-পর্দায় গানবাজনা হবে না, শুধু হিসাবনিকাশ হবে। কোনো মানে হয় ?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে।

তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুল হু আল্লাহ পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনের রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চ্যাংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'স্যার, কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জিএম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন।—আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আচ্ছা।

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কী বলেন স্যার?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসিহাসি মুখে বলল, গতকাল যা যা বলেছিলাম সেসব কি স্যার আপনার মনে আছে?

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাটো ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপারটা কি?'

'মনে নাই।'

'র‍্যাম কী সেটা মনে আছে?'

'না।'

'মনে না থাকলে নাই। এটা এমনকিছু জরুরি ব্যাপার না। মেগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেকজন মানুষের যেমন স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু-কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেগা হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার, বুঝতে পারছেন?'

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেননি। তার পরেও বললেন, বুঝতে পারছি।

'একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন—কম্পিউটার হল আয়নার মতো।'

'আয়নার মতো?'

'হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়—আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তা-ই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপনাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়ের ভেতরের পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কী? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এল কীভাবে? মেয়েটা কে? তার নাম কী? চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, স্যার!

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না তো!'

'তা হলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কীভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না, হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হল আমাদের ফাইলিং কেবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কীভাবে বের করব?...

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হল—তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথাধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোঝাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

'স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ

ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, কেমন আছেন শওকত সাহেব ?

'জ্বি, স্যার, ভালো।'

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

'আপনার কি শরীর খারাপ ?'

'জ্বি না স্যার।'

'দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হল ?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি—তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিস শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না।

'তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন ?'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলছে, আপনি পারবেন না কেন ? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরানো দিনের মতো কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন—হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।'

'জ্বি স্যার।'

'নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি—সারভাইব্‌ল্ ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন ?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না। আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনোদিন শিখতে পারবেন না, তা হলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না ?'

'জ্বি স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, আজ তা হলে যান।'

বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরো বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়েবাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানিং তাঁর ঘনঘন মাথা ধরছে। চোখ আরও খারাপ করছে কি না কে জানে ! চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা-তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। তিনি তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেয়ে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না। তার চা সবসময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢোকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনও আছে ? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য ! মেয়েটা তো আছে ! আগেরবার বসে ছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো ! গাল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে ? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁথির মালা। মালাটা আগে লক্ষ করেননি। শওকত সাহেব নিচুগলায় বললেন, তোমার নাম ?

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, চিত্রলেখা।

'বাহ্, সুন্দর নাম !'

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কী বলা যায় ? আয়নার ভেতর সে এল কি করে এটা কি জিজ্ঞেস করবেন ? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো ? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মেয়েটা বলল, আপনার কপালে কী হয়েছে ?

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

'খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'আমি পড়ি না।'

'স্কুলে যাও না?'

'উহুঁ।'

'আয়নার ভেতর তুমি এলে কী করে?'

'তাও জানি না।'

'তোমার বাবা-মা, তাঁরা কোথায়?'

'জানি না।'

'তোমার মা-বাবা আছেন তো? আছেন না?'

'জানি না।'

'তুমি কি একা থাক?'

'হুঁ।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দু'টি হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাঁপছ কেন? শীত লাগছে নাকি?'

'হুঁ, এখানে খুব শীত।'

'তোমার কি গরম কাপড় নেই।'

'না।'

'তোমার এই একটাই জামা?'

'হুঁ।'

'আমাকে তুমি চেন?'

'চিনি।'

'আমি কে বল তো?'

'তা বলতে পারি না।'

'আমার নাম জান?'

'আপনি তো আপনার নাম বলেননি। জানব কীভাবে?'

'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার তিন মেয়ে।'

'ছেলে নাই?'

'না, ছেলে নাই।'

'আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে?'

'বিয়েবাড়িতে গেছে।'

'কার বিয়ে?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলেনি।'

'আপনার মেয়েদের নাম কী?'

'বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজোটার নাম সোমা, সবচে' ছোটটার নাম কল্পনা।'

'ওদের নামে কোনো মিল নেই কেন? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে। বড়মেয়ের নাম ইরা হলে মেজোটার নাম হয় মীরা, ছোটটার নাম হয় নীরা...।'

'ওদের মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেননি কেন?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমার নাম কারও পছন্দ হয়নি।'

'আপনি কী নাম রেখেছিলেন?'

'বড় মেয়ের নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া। মহীয়সী নারীর নামে নাম। তার মা পছন্দ করেনি। তার মা'র দোষ নেই। পুরানো দিনের নাম তো, এইজন্যে পছন্দ হয়নি।'

'বেগম রোকেয়া কে?'

'তোমাকে বললাম না মহীয়সী নারী। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তুমি তাঁর নাম শোননি?'

'জ্বি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আঁতকে উঠলেন। ওরা বোধহয় চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্রয়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন। ওদের সামনে আয়না বের করার কোনো দরকার নেই। তারা কী না কী মনে করবে- দরকার কী? অবশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না, সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনী স্যার স্কুলের সামনের বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন। এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে

যাচ্ছেন ; হঠাৎ দেখেন অবনী স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন। অবনী স্যার তাঁকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তার পরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়তো তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভরতি হতে কত টাকা লাগে কে জানে ! টাকা বেশি লাগলে ভরতি নাও করাতে পারে। হয়তো নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবন্ধ করে রাখবে কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন জন্তুর মতোই।

মনোয়ারা বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরেননি। মেজো মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়েবাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।

মাস্টার সাহেব বললেন, আচ্ছা, চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হল। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কী কথা বলবেন ?

মাস্টার সাহেব বললেন, আপনার গালে কী হয়েছে ?

'দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভালো দেখা যায় না।'

'নতুন একটা কিনে নেন না কেন ?'

'ইরার মাকে বলেছি—ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে ?'

'ভালো। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান ?'

'আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই—ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি।'

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে-কোনো খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন। নিজেকে সামলালেন, কী দরকার ?

'মাস্টার সাহেব !'

'জ্বি।'

'আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায় ?'

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তা হলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না ?

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।'

শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কীভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং—চোদ্দ রকম যন্ত্রণা ! তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যে সব গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিস বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বাচ্চা একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নিই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।

শওকত সাহেব বললেন, আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না বাদ দাও।

'বাদ দিলে চলবে কী করে স্যার ? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শিট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।

'কী যে স্যার বলেন ! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে ? চাকরি ছাড়লে খাবেন কী ? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তাঁর কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইরেজি করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো জোগাড়। সেই ডাটা কীভাবে উদ্ধার হল তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক লোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন স্যার, দু'টা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটির নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম !'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না, তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, স্যার আসুন বিসমিল্লাহ্ বলে লেগে পড়ি। শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, আজ থাক। আজ আর ভালো লাগছে না।

'জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কী আর করা ! আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধুশুধু তুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

'একটা জিনিস দেখো তো !'

শওকত সাহেব ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, জিনিসটা একটু ভালো করে দেখো তো !'

'জিনিসটা কী ?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, দেখলে ?

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, দেখলাম।

'কী দেখলে বলো তো ?'

'পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে ?'

'না আমার শখের একটা আয়না।'

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনও তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হল

তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধ হয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন—ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুখি-দুখি লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, কেমন আছ চিত্রলেখা ?

'ভালো।'

'তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন ? মন খারাপ ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ কেন ?'

'একা একা থাকি তো এইজন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয়-ভয় লাগে।'

'কীসের ভয় ?'

'জানি না কীসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস ?'

'হুঁ।'

'আপনার টেবিলের উপর কী ? বাক্সের মতো ?'

'এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিত্রম কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার কী ?

'একটা যন্ত্র। হিসাবনিকাশ করে। আচ্ছা শোনো চিত্রলেখা, তোমার বাবা মা আছেন ?'

'জানি না তো।'

'তুমি আজ কিছু খেয়েছ ?'

'না।'

'তোমার খিদে লেগেছে ?'

'হুঁ।'

'তুমি যেখানে থাক সেখানে কোনো খাবার নেই ?'

'না।'

'জায়গাটা কেমন ?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।'

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কীই-বা করতে পারেন ! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে

টিফিন-কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোনো উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার ? আরে কী আশ্চর্য ! তিনি এসব কী ভাবছেন ? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনো মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালোই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খাননি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি ? কত দাম এক ছটাক বাদামের ? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তার পরই মনে হল বাচ্চা একটা মেয়ে না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হল—তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলি তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিনভরতি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন পুরুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি ?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা...

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দুদিন আসবে। পনেরো শো টাকা সে নেয়, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিন শো। মেয়ের এত শখ ! তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কী শখ, কী ইচ্ছা, তুমি কিছুই জান না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশো—তের শো। বাড়তি তেরো শো টাকা কোত্থেকে আসবে ? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশো টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কী ? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন ?

মনোয়ারা বললেন, সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কী, কথা বলছ না কেন ?

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

'তোমার সঙ্গে বসে যে দুটো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম !'

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন—

তুমি বাস কি না তা আমি জানি না
ভালোবাস কি না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব...

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দু'টা কথা বললে কেমন হয় ? কেউ এসে দেখে না ফেললে হল। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেমন আছ চিত্রলেখা ?'

'জ্বি, ভালো আছি। কে গান গাচ্ছে ?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা ?'

'হ্যাঁ, ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে !'

'মনে থাকবে না কেন ? আমার সবার নামই মনে আছে—ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন-খারাপ। আপনার কী হয়েছে ?'

'কিছু হয়নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এল। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন-খারাপ কেন—আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে বললেন, তুমি কি গান জান ?

'জ্বি না।'

'আচ্ছা শোনো, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কি খেয়েছ ? খিদে কমেছে ?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, আপনি কী যে বলেন ! খাব কী করে ? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে ?

'খাবার নেই ?'

'না। কিচ্ছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দু'হাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, শীত লাগছে মা ?

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।'

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন ? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে এসে বটগাছের মতো বসে থাক। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

২

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কী স্যার, বলিনি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব ?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, আর কোনো সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমি আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি—প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মতো পরিষ্কার।

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলাম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলি কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কীভাবে বোঝালে আপনি বুঝবেন।'

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি ভেবে পেলেন না এরকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন ?

'স্যার, আমি যাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি সত্যি পানি চলে এল। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সেজন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ্য তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম কিনলেন। তারপর কোনোকিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা সুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভালো ভালো সুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। সুয়েটার কিনতে তিনশো চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। শাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু সুয়েটার গায়ে দিয়েই তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়। শওকত সাহেব জানেন সুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে। চিত্রলেখাকে এই সুয়েটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমোলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তার পরেও মনে হল—মেয়েটা দেখবে জিনিসটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হল, ভালোই হয়েছে। সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে' ভালো লাগে অজানা কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভালো হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের ওপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে ? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, বাবা, তুমি কী খুঁজছ ?

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না ? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব কী বলছিস ! কোথায় ফেলেছে ?

'পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এরকম করছ কেন বাবা ?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, কিছু বোঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ ?

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেঁটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, তোমার কী হয়েছে বাবা ?

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, চিত্রলেখাকে খুঁজছি রে মা-চিত্রলেখা।

'চিত্রলেখা কে ?'

'আমি জানি না কে ?'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন— চিত্রা মা রে, ওমা, তুই কোথায় ?